রক্তলাল ফেব্রুয়ারী

সম্পাদকীয়

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, পৃথিবী গ্রহের শান্তি ও বিশ্ব মানবতার মূল দুশমন—সাম্রাজ্যবাদের ঘৃনা ষড়যন্ত্রে তদানন্তিন পাকিস্তানের শাসক-শোষক গোষ্ঠী আমাদের দেশকে উপনিবেশিক ধরণের শোষণের অভিষ্ট লক্ষ্যে চারণভূমি হিসাবে চিরস্থায়ী করার জন্য দ্বি-জাতিতত্ত্বের কৃত্রিম সফলতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে দ্বিতীয় পদক্ষেপে সুপরিকল্পিতভাবে আঘাত হানে বাঙালী জাতির মুখের ভাষা 'বাংলা'র উপর। আর এ হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে এ'দেশে আত্মত্যাগী সচেতন দেশপ্রেমিক সংগ্রামী রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ও জনতা প্রতিবাদের ঝড়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সেই প্রতিরোধে শাসকের ভিত কাঁপতে থাকলে তারা মরিয়া হয়ে জনতার মিছিলে গুলি চালিয়ে ঢাকার রাজপথ রক্তে লালে লাল করে তোলে বাহান্নের ফেব্রুয়ারীতে। সেই রক্ত ছুয়ে বাঙালী জাতি অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শোষণবিরোধী আকাঙ্খা নিয়ে যে অভিযাত্রা শুরু করেছিল সে পথ ধরে ৫৪, ৬২, ৬৬, ৬৯, ৭০ এর গণজোয়ার এবং ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে মিথ্যা দ্বি-জাতিতত্ত্বের কবরের উপর জন্মলাভ করেছে এ জাতীর স্বাধীন দেশ—বাংলাদেশ। স্বাধীনতার এগারো বছরে অনেক উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে দেশে যে শূন্যতা ও সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে শাসক মহলের অবস্থানগত কারণে সেই ৫২ ও ৭১ এর পরাজিত দেশীয় আন্তর্জাতিক শত্রুরা আবার মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং একত্রিশ বছরের প্রতিষ্ঠিত বাঙালী জাতির চিরাচরিত ঐতিহ্য এবং ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির নিদর্শন শহীদ মিনার ধ্বংসের পায়তারা করছে। তা ছাড়া দেশের বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, কৃষি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে গণবিরোধী নীতিসমূহ গৃহীত হয়েছে তারই প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে বাংলাদেশ। আবার রক্তে লাল হয়েছে এ ফেব্রুয়ারী।

রক্তলাল ফেব্রুয়ারী শিক্ষা দিয়েছে মাথা নত না করতে। আর সে পথ ধরেই চলবো। প্রতিক্রিয়ার দুর্গ ভেঙ্গে শোষণ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা - সমাজতন্ত্র আনবোই।

রক্তলাল ফেব্রুয়ারী

একুশে প্রকাশনা—তেরাশি।

যারা লেখার অংশ নিয়েছেন

—নির্ম্মল রুদ্র দেব

—ফিরোজ মোহাম্মদ ফারুক

—তোছাদ্দক হোসেন

—অজয় রায়

—এ্যাডভোকেট আমান উল্যা

—জাহেদুল হক মিলু

—সাইফুল আলম দুলাল

প্রচ্ছদ করেছেন

—নেজামুল হক বিলু

—জাহেদুল হক মিলু

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন

—এ্যাডভোকেট নজির হোসেন সরকার

—এ্যাডভোকেট এনামুল হক চৌধুরী (চাঁদ)

সহযোগিতা করেছেন

—পীযুষ কান্তি রায়

প্রকাশ করেছেন

—মহান একুশ উৎযাপন কমিটি '৮৩—কুড়িগ্রাম

সম্পাদনা করেছেন

—হারুন অর রশীদ লাল

মুদ্রণ করেছেন

—সারদা প্রেস, কুড়িগ্রাম।

একুশের প্রায়োগিক স্বার্থকতা

—নির্মল রুদ্র দেবু

মহান "একুশে ফেব্রুয়ারী" আমাদের জাতীয় জীবনে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য করণীয় দিকটিকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। নেহাত ভাষাগত অধিকারকে স্থূলভাবে প্রতিক্রিয়াশীলরা সমাজের সামনে এনে তাদের অপকর্মকে আড়াল করবার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। কিন্তু, ভাষা তথা সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যে মূলতঃ সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামেরই ভাবাদর্শগত লড়াই, এ সত্যকে তারা বাঙালী জাতীর স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলতে চক্রান্ত করে আসছে।

২১শে ফেব্রুয়ারীর সংগ্রামী ইতিহাস মনে করে দেয় মহান 'মে দিবসের" কথা। সিকাগোর সেই মর্মান্তিক আত্মত্যাগ যেভাবে গোটা বিশ্বের উৎপাদক শ্রেণীতে ঐক্যবদ্ধ হতে শিক্ষা দিয়েছে। শিক্ষা দিয়েছে শোষক শ্রেণীকে চিহ্নিত করতে এবং শ্রমজিবীদেরকে অধিকার কেড়ে নিতে লড়াইয়ের সূচনা হিসেবে গ্রহণ করতে উদ্দীপ্ত করে আসছে। বাংলার মাটিতে ২১শে ফেব্রুয়ারী গোটা জাতীয় জীবনে তেমনি একটি পথ নির্দেশক।

অধিকার হারা মানুষের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম বিজয় সূচীত হয়েছিল "২১শে ফেব্রয়ারী'র আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজয়েও ইতিহাস শুরু হয়েছিল একই দিনে। তাই, বছরের এই রক্তিম দিনটিকে শোষক ও অত্যাচারীরা দারুণ ভয় পায়। সেই থেকেই ওরা চক্রান্ত করে আসছে একুশের মাহাত্মকে নস্যৎ করতে। দিন যাচ্ছে আর গণ-বিরোধীরা আতংকিত হচ্ছে ওরা দারুণ ভয় পায় মানুষের বিকশিত সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে। আর তাই নগ্নভাবে সবার বাকস্বাধীনতাকে পর্যন্ত কেড়ে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। চিন্তা করে না বে-পরোয়াভাবে অগ্রসরমান অবহেলিত মানুষের বিকশিত গতিকে রোধ করবার (?) মত দুঃসাহস দেখাতে। প্রাত্যহিক ঘটনাগুলো নিঃসন্দেহে প্রগতির বিপরীতে প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নির্লজ্জ আক্রমণ এবং নির্ধারিত পরাজয়েরই সাক্ষ্য বহন করছে।

ইতিহাসের শিক্ষা থেকে দৃঢ়তার সাথে বলা যায় ২১শের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জনের সূত্রপাত ঘটেছে তা উত্তরোত্তর বিজয়ের নূতন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে এ জাতীর সামনে। অব্যাহত ভাবেই তা চলবে। যে ঐক্যস্রোত সম্মিলিত শক্তিতে শত্রু হাতে প্রতিক্রিয়াকে আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—তার জয় অবশ্যই ঘটবে। আর, তবেই হবে ২১শে ফেব্রুয়ারী বাঙালী জাতীয় জীবনে ১লা মে দিবসের মতই স্বার্থক।

মৃত্যু ভয়কে পদানত করে

—ফিরোজ মোহাম্মদ ফারুক

একুশ আসছে। একুশের চেতনার তাৎপর্য্য সর্বজনবিদিত। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও একুশ বিশেষ তাৎপর্য্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে তথাকথিত পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি করে যথাক্রমে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বুর্জুয়াদের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পন করে। ফলে আমাদের দেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর পাক-শাসকগোষ্ঠী তাদের শোষণের চারণ ভূমি হিসেবে পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়। বাংগালী জাতিকে জাতীয় চেতনা থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে তারা প্রথমে ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। আর সেই হীন চক্রান্ত প্রতিহত করতে সমগ্র বাংগালী জাতি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শোষক গোষ্ঠীর বুলেটে ভাষার শহীদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়। জন্ম হয় বাহান্নের একুশের। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ সেই আন্দোলন দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়। শেষ পর্য্যন্ত শাসক গোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু শোষক গোষ্ঠী প্রাথমিকভাবে পরাজিত হলেও তাদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং একুশের চেতনাকে বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও নস্যাৎ করার নানারূপ প্রচেষ্টা চালায়। একুশের উপর, সর্বোপরি ৭১ সালে তারা যেমন গণহত্যা করেছিল তেমনি কামানের গোলার ধূলায় মিশে দিতে চেয়েছিল ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন "শহীদ মিনার"। প্রথম থেকেই পরিলক্ষিত হয় যে জাতির কলঙ্ক বাঙালী নামধারী কিছু সংখ্যক মীরজাফর স্বীয় হীনস্বার্থে শোষক গোষ্ঠীকে সহায়তা করে আসছে।

জাতীয় অধিকার, স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জনের সংগ্রামে একুশ দীপ্তিমান। বাহান্নে যে শহীদেরা ভাষার অধিকার ও জাতীয় বিকাশের স্বার্থে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাদের সেই অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করে অগ্রসর হয়েছে এ জাতীর মুক্তি সংগ্রাম।

দেশবাসীর জীবনে শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটানো, সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে দেশকে মুক্তকরা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একুশ আজ আমাদের বলীয়ান সাথী। সেই পরাজিত শত্রুরা আজ বিশেষ মহলের ছত্র-ছায়ায় ধর্মের লেবাসে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি ও অপসাংস্কৃতিক কুলষতা বিস্তারে উন্মত্ত। এখানে বলা যায় যে যারা জাতীয় জীবনের মুক্তি অর্জনের

ধারাকে রোধ করতে চায় তারাই একুশের তাৎপর্য্যপূর্ণ চেতনাকে গণমানস থেকে মুছে ফেলতে চায়।

বর্তমানে দেশ এক চরম সংকটে নিমজ্জমান। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কাছে অর্থনীতি বিকিয়ে দেয়া হয়েছে। নয়া উপনিবেশবাদের নিগড়ে দেশ জড়িয়ে পড়ছে, অপরদিকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সম্পদের পাহাড় গড়ছে। জনজীবনে নেমে এসেছে চরম সংকট। সরকার "শিল্পনীতি" ঘোষণা করে জাতীয় অর্থনীতিতে এবং "শিক্ষা সংকোচন নীতি" ঘোষণা করে ও প্রাথমিক স্তরে দু'টি বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ায় শিক্ষাঅঙ্গনে বিপর্য্যয় নেমে এসেছে। একুশের পাদদেশে এসে আবারো সংগ্রামী ছাত্রদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হচ্ছে। সরকারের গণবিরোধী পদক্ষেপসমূহ জাতিকে আর একটি দুর্যোগের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

এই সংকটময় মূহুর্তে দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তি একুশকে সামনে রেখে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছে। এটা আনন্দের বিষয় কিন্তু এতে উল্লোসিত হবার অবকাশ নেই। গণতান্ত্রিক সংগ্রামে জয়ী হতে হলে একুশের চেতনাকে সামনে রেখে সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে একটি "নূন্যতম কর্মসূচী'র ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বার গণআন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে—তবেই জয় সম্ভব। এর আর কোন বিকল্প নেই।

সংস্কৃতির ব্যাপকতা ও মুক্ত বিকাশের সাথে জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন একান্তভাবে যুক্ত। মেহনতী মানুষের জীবিকার সংগ্রামের সাথে শিল্প ও সংস্কৃতির আন্দোলন অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। একুশের সংগ্রামের মুলশক্তি এসেছে মেহনতী মানুষের অংশ গ্রহণের ভিতর দিয়ে। আর এ চেতনাকে মানুষের মুক্তির আন্দোলনে নিতে হলে তা সকল শ্রমজীবি মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

তাই একুশের বরাবর ও চেতনায় বলীয়ান হয়ে আমাদের অগ্রাভিযানে পরিচালিত করতে হবে - আমাদের সাংস্কৃতিক মুক্তি তথা জাতীয় মুক্তির পথে অর্থনৈতিক সামাজিক বন্ধনমুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সুখী-সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে—। আর এ আন্দোলনের পথে যদি মৃত্যু সাথী হয় তাকেও পদানত করে অকুতভয়ে রক্তঝরা পথে এগিয়ে যেতে হবে। শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যায়নি আর কখনও যাবেও না। এখানে কবির ভাষায় বলা যায়—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই"।

একুশে আমার স্মৃতি ও ভাবনা

—তোছাদ্দক হোসেন

একুশকে সামনে রেখে লিখতে গিয়ে প্রথমে আমার জীবনে একুশ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে বর্ণনা দিয়েই শুরু করছি।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হলো। পাকিস্তান হওয়ার পরের বৎসর আমার বেশ মনে আছে। আমাদের গ্রামের দু'জন ছাত্র কারমাইকেল কলেজে লেখা-পড়া করতো। ওনারা গ্রামে এসে স্কুলের ছাত্রদের ডেকে বলাবলি করত, এমনি কি রাগারাগী পর্যান্ত করত, একি কাণ্ড "উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা" করতে চায়। বাংলা কেন রাষ্ট্রভাষা হবে না? তোমরা স্কুলের ছাত্র, এর প্রতিবাদ কর, ইত্যাদি-ইত্যাদি। আমি রাষ্ট্রভাষা কি তখন বুঝতাম না, শুধু রাগারাগীটা অনুভব করতাম। ১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি, বেশ বুঝতে পারি, স্কুলে বেশ গুঞ্জন, ছেলেদের ক্লাশ বর্জ্জন। ঢাকায় বরকত, ছালাম, রফিক, জব্বার সহ নাম না জানা অনেক ছাত্রদেরকে হত্যার প্রতিবাদ মিছিলে যোগদান। রফিক ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। "বাংলা ভাষা চালু কর" ইত্যাদি শ্লোগান। গ্রামের স্কুলে পরের দু'বছর কি হলো মনে নেই। ১৯৫৪ সাল, দশম শ্রেণীর ছাত্র ইতিহাসের ক্লাশ চলছে বাবু বাগীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ক্লাশ নিচ্ছিলেন হঠাৎ এক জায়গায় একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন "তমুদ্দিন"। এ শব্দের অর্থ কি তিনি নিজে জানেন না এবং আমরা কেউ জানি কি না জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু আমরা সবলেই নিরুত্তর। শব্দটির বাংলা অর্থ জানার জন্য একে একে সকল শিক্ষক শেষে বাংলা অভিধান কিন্তু এ শব্দের অর্থ পাওয়া গেল না, এ নিয়ে স্কুলে সেদিন ভীষণ হৈ চৈ। কিছুদিন পর অবশ্য শব্দটির বাংলা পরিভাষা বের করেছিলেন "বাংলা একাডেমী" থেকে। এ রকম বহু বিদেশী উর্দ্দু, আরবী শব্দ দিয়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতির নামে সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটানোর কৌশল নিয়েছিলেন পাকিস্তানী শাসক-গোষ্ঠীর এ দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল অনুচরেরা। কিন্তু কেন এ কৌশল?

ঔপনোবেশিক সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর অনুচরেরা জানে যে কোন জাতি সত্তার বিকাশ অর্থই শ্রমজীবি, পেশাজীবি তথা সর্বহারা শ্রেণীর বিকাশ মানই শোষণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার মূল উৎপাটন। তাই তারা নানা কৌশলে জাতি সত্তার বিকাশের মাধ্যম ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার কৌশল নিয়েছিল। তাই ১৯৫২ সালে বাংগালীকে "উর্দ্দু ভাষা" বানানোর অপচেষ্টা আজকেও "আরবী ভাষা" করণের ব্যর্থ প্রয়াস। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী একটু শুধরে নিয়ে বলেছেন "আরবী ভাষা" নয় "ইসলামিয়াত" করণ।

আজ ৫২ এর পর ৮৩ এর একুশেও চক্রান্ত শেষ নেই। তাই এবারের একুশেও প্রতিরোধের ঝাণ্ডা নিয়ে সামনে এগুতে হবে।

বাংলাদেশে শ্রেণী বিভাজন প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক দলের বিকাশের সমস্যা

—অজয় রায়

সাধারণভাবে একটা কথা আজকাল ব্যাপকভাবে চালু। তা হলো আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলি দিয়ে কিছু হবে না। অফিস কর্মচারী, চাকুরিজীবী, গ্রামের কৃষক, কারখানার শ্রমিক প্রভৃতি প্রায় সব শ্রেণীর মানুষের সাথে আলাপ করলে সাধারণভাবে এই প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করে থাকেন সবাই। একটা সাধারণ অনীহার ভাব সর্বব্যাপক। আমাদের দেশে আজ যে সংকটগুলি বিরাজ করছে তার সাথে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলসমূহ সম্পর্কে এই সর্বজনীন অনীহা অন্যতম। শুধু অন্যতম বললে ভুল হবে, অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল সম্পর্কে অনীহার প্রশ্ন হলে ব্যাপারটা নিয়ে বর্তমান আলোচনার অবতারণা করার প্রয়োজন দেখা দিতো না। কিন্তু এটা কার্যত সর্বজনীন রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে অনীহা থেকে রাজনীতি সম্পর্কে যে অনীহা বর্তমানে সৃষ্টি হয়েছে তা আজ দেশে সৃষ্টি করেছে এক শূন্যতা। আর এই শূন্যতা সৃষ্টি করছে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ। স্বাধীনতার পর দশ বছরের ইতিহাস দেখলে আমরা বুঝতে পারবো, এই অস্থিতিশীলতা কতটুকু মারাত্মক। তা সমস্ত জাতীয় অগ্রগতির সম্ভাবনাকেই ব্যাহত করে।

কেন এই অবস্থা সে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে সেসূত্রে দু'একটি কথা বলে নেয়া দরকার। কথাগুলি হয়তো স্বতঃসিদ্ধ। তবু তার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন দলের রাজনীতির প্রশ্নটা শ্রেণীর সাথে জড়িত। বিভিন্ন শ্রেণী বা একই শ্রেণী বা স্তরের মাঝে বিভিন্ন অংশের আশা-আকাঙ্খা, তাদের স্বার্থ তুলে ধরার প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। অবশ্য কোন জাতি যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম করে তখন অনেক সময় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতাকামী শ্রেণীগুলিকে নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক দলও গড়ে ওঠে। এ জাতীয় রাজনৈতিক দলের ভিত্তি সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার সাধারণ স্বার্থ। তবে একটি রাজনৈতিক দলের আকারে গড়ে উঠলেও এ জাতীয় দলের মধ্যে অনেক সময়ই বিভিন্ন বিভাগ-উপবিভাগ বা ঝোঁক দেখা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত বলেই এ অবস্থাটা সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জিত হবার পর অবস্থাটা

ঠিক তা থাকে না। কারণ স্বাধীনতার পরে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রশ্নগুলিই জরুরী হয়ে ওঠে। আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নটির সাথে তা কোন শ্রেণীর স্বার্থে সেই প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়। স্বাধীনতার আগে যেমন পরস্পরবিরোধী শ্রেণীগুলি জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হয়, স্বাধীনতার পরে এরূপ ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সাধারণভাবে বিদ্যমান থাকেনা। আর তাই তখন বিভিন্ন শ্রেণী বা শ্রেণীর অংশের স্বার্থকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক দলসমূহ গড়ে ওঠে। এই কথাগুলি সাধারণ সত্য। আর এই সাধারণ সত্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বছরগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বিকাশের যে চেষ্টা চলছে তার ধরন পুঁজিবাদী। স্বাধীনতা পরবর্তী প্র- তিন বছরে কোন কোন ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশকে প্রতিহত করার যে লক্ষণ-সমূহ দেখা দিয়েছিল তা সে সময়েই সংহত হতে পারেনি নানা কারণেই। ৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর উক্ত লক্ষণগুলি একে একে বাতিল করে অবাধ পুঁজিবাদী বিকাশের ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে। বর্তমান দুনিয়াতে পুঁজিবাদের দুনিয়া জোড়া সংকট যখন ক্রমে গভীর হচ্ছে তখন কোন সদ্য স্বাধীন দেশে পুঁজিবাদের স্বাধীন ও অবাধ বিকাশ আশা করা বাতুলতা। সদ্য স্বাধীন দেশসমূহের যেখানে পুঁজিবাদী বিকাশের ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে সেখানে পুঁজিবাদের স্বাধীন ও অবাধ বিকাশের পরিবর্তে বা সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল পুঁজিবাদ হিসাবে গড়ে উঠেছে ও গোড়া থেকেই সম্মুখীন হচ্ছে নানা সমস্যার। বাংলাদেশের বিশেষ অবস্থায় পুঁজিবাদী বিকাশের ধারা অনুসরণের ফলে এ দেশে সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল আমলামুৎসুদ্দী ধরণের পুঁজিই ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আবার পুঁজিবাদী বিকাশের পর্যায়ও নানা কারণেই থেকে গেছে খুবই অনুন্নত পর্যায়ে। এখানে অবশ্য পুঁজিবাদী বিকাশ সব সময়ই অনুন্নত পর্যায়ে ছিল আর তার অগ্রগতি ছিল প্রতি পদক্ষেপে বাধাগ্রস্ত।

পুঁজিবাদী সমাজে গোটা সমাজ একদিকে পুঁজিপতি অন্যদিকে শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, মেহনতী কৃষক প্রভৃতি শ্রেণী বা স্তরে স্বাভাবিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়া এখানেও চলছে। পুঁজিবাদী বিকাশ ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টার ফলে এই বিভাজন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে। একদিকে পুঁজিপতি যদিও মুষ্টিমেয় তবুও ক্রমে সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে নিঃস্বকরণের প্রক্রিয়া তরান্বিত হবার ফলে ব্যাপক সংখ্যক নিঃস্ব ভূমিহীনের দল বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পুঁজিবাদী বিকাশের ধারা অনুসরণের স্বাভাবিক পরিণতিতে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত প্রভৃতির জীবনের সংকট গভীরতর হচ্ছে প্রতিদিন। এভাবে বাংলাদেশে শ্রেণী বিভাজন প্রক্রিয়া চলছে এবং সমাজ নানা শ্রেণী ও স্তরে ক্রমে

বিভক্ত হয়ে পড়ছে। আর তার ফলে রাজনৈতিক দলসমূহ বিশেষত যে সব রাজনৈতিক দলে মধ্যস্তরের প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে নানা টানাপোড়েন। আমরা যখন বলি যে সমাজে পুঁজিপতিদের অবস্থান ক্রমে শক্তিশালী হচ্ছে তার মধ্যস্তরের ভিতর থেকেই একাংশ ক্রমে উন্নীত হচ্ছে পুঁজিপতিদের স্তরে। ফলে মধ্যস্তর প্রভাবিত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পুঁজিপতিদের অবস্থান ক্রমে সংহত হচ্ছে। আবার তার বিপরীতে মধ্যস্তরের বেশীর ভাগের মধ্যে সংকট বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যে ক্ষোভ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে তার কারণেই এই দলগুলির মাঝে এক ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়া চলছে। সৃষ্টি হচ্ছে নানা ঝোঁক। এভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির বর্তমান অবস্থা বুঝতে গেলে এই বিশেষ পর্যায় বা পরিস্থিতিটা মনে রাখতে হবে।

আমরা গোড়ার আলোচনা শুরু করেছিলাম রাজনৈতিক দলগুলির উপর জনগণের আস্থার প্রশ্নটি নিয়ে। রাজনৈতিক দলগুলির মাঝে কতকগুলি দল ঐতিহাসিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দলগুলি যেমন মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তেমনি গণস্বার্থের প্রতিটি প্রশ্নে এদের অবস্থান ছিল গণস্বার্থের বিরুদ্ধে। কাজেই এদের উপর জনগণের আস্থার অভাব থাকবে তা স্বাভাবিক। বস্তুতপক্ষে এক সময় এই দলগুলি জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। পরবর্তীতে স্বাধীনতার পরে স্বাধীনতাকামী দলগুলি বিশেষত শাসকদল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা যথাযথভাবে পূরণ করতে না পারায় যে শূন্যতা বা সংকট সৃষ্টি হয়েছে এই দলগুলি সেই সুযোগে আসর সরগরম করতে চাইছে। এরা জনগণকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু এরা জনগণের আস্থা অর্জন করবে সে প্রশ্ন ওঠে না। তা অবান্তর। এখানে একটা কথা বলে নেয়া দরকার, সে হলো, পুঁজিবাদী পন্থা অনুসরণ করার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের সমস্যার যেমন কোন সমাধান হতে পারে না তেমনি পুঁজিবাদের স্বাধীন অব্যাহত বিকাশের ফলে একটা দেশে যে প্রবৃদ্ধি দেখা দেয় তেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এখানে সম্ভব নয়। কারণ এখানে যে ধরণের পুঁজিবাদ বিকশিত হচ্ছে তা যেমন স্বাধীন নয়, সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল আবার কতকগুলি সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে তার অব্যাহত বিকাশও বাধাগ্রস্ত। বাংলাদেশে পুঁজিবাদী বিকাশের ধারা নীতি হিসেবে অনুসরণ করলে এর ব্যতিক্রম হবে না। আর পুঁজিবাদীরা স্বভাবতই পুঁজিবাদী বিকাশের ধারাই অনুসরণ করতে চাইবে। ফলে মধ্যস্তর প্রভাবিত যে রাজনৈতিক দলগুলির মাঝে পুঁজিপতিদের অবস্থান শক্তিশালী হয়েছে সেখানে বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রশ্নে দলের মধ্যে পুঁজিবাদী অংশের অবস্থান যেমন গণস্বার্থের অনুকূল নয় (পুঁজিবাদী স্বার্থ রক্ষার জন্য এরূপ হতে বাধ্য) আবার দেশের সামনে আজ যেসব সমস্যা মূল অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বেকার

সমস্যার সমাধান প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা সেসব সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারে না। ফলে এদের পক্ষে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করা বা এদের উপর যে আস্থা ছিল সে আস্থা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে মধ্যস্তরের যে অংশটি পুঁজিবাদের পর্যায়ে উন্নীত হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি, এবং যাদের অবস্থান ক্রমেই সংকটের জালে জড়িয়ে পড়ছে তাদের মধ্যেও সৃষ্টি হচ্ছে নানা ঝোঁক। অনেক সময় অবস্থা বিবেচনা না করে দ্রুত কিছু করে ফেলার আশংকা থেকে এদের মধ্যে নানা উগ্র বা হঠকারী ঝোঁক পরিলক্ষিত হচ্ছে। বস্তুত উগ্রতা বা হঠকারিতা এসব দেশের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে।

আর এখানেই আদর্শের প্রশ্নটি এসে পড়ে। বাংলাদেশে শ্রেণী বিভাজনের প্রক্রিয়া যে এখনো চলছে সে কথা আগেই বলেছি। শ্রেণীগুলি বিভক্ত হয়ে উঠছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলি এখনও সংহত হয়ে উঠতে পারেনি। শ্রেণীগুলির সংহতিতে আদর্শও একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। পুঁজিবাদী ধারায় বাংলাদেশের কোন ভবিষ্যৎ নেই। আমাদের জাতীয় সমস্যাসমূহের সমাধান একমাত্র পুঁজিবাদের পথ পরিহার করে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে অপুঁজিবাদী বিকাশের পথ অনুসরণের মাধ্যমেই হতে পারে—অন্যভাবে নয়। আর এই আদর্শ শুধু শ্রমিক শ্রেণী নয়, ক্ষেতমজুর, মেহনতী কৃষক ও মধ্যস্তরের ব্যাপক জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। কিন্তু আদর্শের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী ভাবধারার আধিপত্য বিদ্যমান। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিরন্তর প্রচারণা ও প্রাধান্য উপরোক্ত ভাবধারা প্রসারের ক্ষেত্রে সমস্যা হিসাবে বিরাজ করছে। এসবের কারণে জন্ম নিচ্ছে নানা ধরণের সুবিধাবাদ। সুবিধাবাদকে সরকারীভাবে উৎসাহিতও করা হচ্ছে। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে এই অবস্থা বিরাজ করতে থাকায় একসময় যে রাজনৈতিক দলগুলি মধ্যস্তরের প্রভাবাধীন ছিল তাদের মধ্যে যারা পুঁজিবাদী ধারা অনুসরণ করতে চায় না তাদের মধ্যেও কি করতে হবে সে ব্যাপারে স্বচ্ছতার অভাব থেকে যাচ্ছে। উগ্রতা বা হঠকারিতার ঝোঁকের কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি। আবার সুবিধাবাদের প্রভাব থেকেও এসব দল মুক্ত নয়। নানা ধরণের সুবিধাবাদী ঝোঁকও এদের মধ্যে দেখা যায়।

বস্তুত কি সমাজ, কি রাজনৈতিক দল, কি ভাবাদর্শ—সব ক্ষেত্রেই আজ এক ভাঙাগড়ার পর্যায়ের ভিতর দিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। সমাজে শ্রেণী বিভাজনের প্রক্রিয়া চলছে, রাজনৈতিক দলগুলির মাঝে তার প্রতিফলন দেখা দিচ্ছে, আর তার কারণে যে দলগুলি এক সময় গণস্বার্থের সপক্ষে ভূমিকা নিয়েছিল সেগুলি পুরোপুরি ভাবে গণস্বার্থের পক্ষে ভূমিকা রাখতে পারছে না।

আবার আদর্শগত বিভ্রান্তির কারণে যারা পুঁজিবাদী ধারার বিকাশ সমর্থন করে না তারাও সব সময় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না। নানা ধরনের হঠকারী, সুবিধাবাদী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

এই অবস্থার মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন দলের মাঝে আজকেই বামপন্থীদের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবছেন একমাত্র অর্থ তবে বর্তমানে বাংলাদেশে বামপন্থীর এটা ইতিবাচক সন্দেহ নেই। বা বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা হলো সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে অপুঁজিবাদী বিকাশের পথ অনুসরণ করার মাধ্যমে ক্রমে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এটা অবশ্য সহজ নয়, কারণ এর অর্থ হলো জনগণকে রাজনৈতিক-ভাবে প্রভাবিত করা। সে অর্থ দীর্ঘ এক সময় ভাবাদর্শ হিসেবে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ জনগণকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল—যদিও এই বুর্জোয়া বিকাশের ধারা যেমন জনগণের সমস্যা সমাধানের পথ দেখাতে পারছে না, তেমনি এই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চেতনাও জনগণের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। এটা হতে বাধ্য, কিন্তু তার বিপরীতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে অপুঁজিবাদী বিকাশের ধারা প্রভাব বিস্তার করতে না পারায় যে শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে তার জায়গায় প্রতিক্রিয়ার ভাবাদর্শ নানাভাবে বিস্তার লাভ করতে চাইছে। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। কাজেই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে অপুঁজিবাদী বিকাশের ধারায় জনগণকে প্রভাবিত করার দীর্ঘ পথ পরিক্রমার সময়ে প্রতিক্রিয়ার যে ভাবধারা আজ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে তার বিরুদ্ধে সাময়িকভাবে নানা ধরনের সাময়িক ঐক্য করার প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে। এগুলি পূর্বোক্ত দীর্ঘ পথ পরিক্রমারই অংগ। আর যাঁরা আজ বামপন্থীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের কথা বলেছেন তাঁদের জনগণকে রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগতভাবে প্রভাবিত করার অব্যাহত ও দৃঢ় প্রচেষ্টার পাশাপাশি পথ পরিক্রমায় সাময়িক যে প্রশ্নগুলি আসে সেগুলির যথা-যথ সমাধান করেই এগুতে হবে। ইতিহাস সব সময়ই আকাঙ্ক্ষিত পথে বা আকাঙ্ক্ষিত দ্রুততার সাথে অগ্রসর হয় না।

আজ রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে ভাঙাগড়া বা বিভিন্নমুখী ঝোঁক দেখা দিচ্ছে গতিশীল শক্তিগুলি যদি সঠিকভাবে চলতে পারে, যদি শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী মানুষের প্রকৃত শ্রেণীর আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে তাহলে এই পর্যায়ের অবসান হয়ে ক্রমে প্রগতিশীল ঝোঁকগুলি সংহত হয়ে উঠবে। আর কে বলতে পারে, তার ভিত্তিতে জন্ম নেবে জনগণের আস্থাভাজন প্রগতিশীল রাজ-নৈতিক দলসমূহ যারা স্বাধীনতাউত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জনগণকে পূর্বোক্ত লক্ষ্যে প্রভাবিত করতে পারবে। আর এই কাজ সম্পাদন করতে যে সময়

লাগবে তার মাঝে প্রতিক্রিয়ার দলগুলিকে প্রতিহত করার জন্য যা করা দরকার তা করতে হবে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে। এভাবেই বর্তমান শূন্যতার অবসান ঘটবে

বর্তমানে বাংলাদেশে এক ভাঙাগড়ার পর্যায় চলছে সে কথা মনে রেখে প্রগতিশীলরা যদি যথাযথভাবে চলতে পারে তাহলে এই তৎপরতার মধ্যেও বিকাশের যে লক্ষণ আছে তার বিকাশ সম্ভব ও অনিবার্য। এক্ষেত্রে একটানা প্রচেষ্টার কোন বিকল্প নেই। তাড়াহুড়া করে লাভ হবে না।

"ভাষা সংগ্রাম আদর্শের সূতিকাগার"

—এ্যাডভোকেট আমান উল্লা

তদান্তিন পাকশাসক গোষ্ঠী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রেরণায় দ্বি-জাতিতত্ত্বের আদর্শের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার আদর্শ কৃত্তিমতায় ভরপুর। কৃত্তিমতা স্থায়ী হয় না। সেটা সম্পূর্ণ সাময়িক। তবে একথা স্পষ্ট করে বলা যায় যে এই দ্বিজাতিতত্ত্বের আবিস্কারের পিছনের উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক ধরণের শোষণ ও জাতিগত নিপীড়ণ চিরস্থায়ী করায় ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র।

কিন্তু বাহান্নের ভাষা আন্দোলনে সেই দ্বিজাতিতত্ত্বের রঙিন কাঁচের প্রাসাদ ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। আর সেই ধ্বংসস্তুপের বুকে নতুন করে জন্ম নেয় অসাম্প্রদায়িক চেতনা বা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ। এবং বাঙালী জাতির ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রক্ষা আর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শোষণ বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তির আন্দোলনের সূচনা হয়।

তাই বলা যায় ৬২'র কুখ্যাত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ৭০'র গণজোয়ার এবং ৭১ এর স্বসস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে স্বাধীন বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম ছাত্রনেতা এবং স্বাধীনতার জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে ৭২ এর সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ভাবে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকে এগুলিকে নিয়ে নানাভাবে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করা হচ্ছে। যাকে প্রতিহত করা গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ ও দেশপ্রেমিক দেশবাসীর জরুরী ও প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই এবারের একুশে আসুন মিলিতভাবে ভাষা, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের শত্রুকে মোকাবেলা করি। এবং মানুষের বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠা করি।

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে

—জাহেদুল হক মিলু

আবারো শোনা যাচ্ছে সেই পুরাতন প্যাঁচাল। ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। একুশ পালনের যে ঐতিহ্য এতদিন প্রচলিত ছিল, তা নাকি সঠিক ছিল না। পরিচিত মহলটির সর্বশেষ এই আবিষ্কারটি বেশ বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। অবশ্য বিতর্কটা নিছক বিতর্ক নয়। এ নিয়ে বিতর্ক হোক, এই আকাঙ্ক্ষাটাই এর বিতর্কটি সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তাহলেই আড়াল হবে, নিরন্ন মানুষের রুটি রুজীর প্রশ্নটি। 'সোনালী সংসার দেব' 'বেকারত্বের অবসান হবে' 'দুর্নীতির মুলোৎপাটন হবে' এমন হাজারো প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতাও কিছুকাল মানুষের চোখের সামনে থাকবে না। সাম্প্রতিক বিতর্কটা অনেককে বিস্মিত করেছে। কিন্তু এটা কি অসম্ভব ছিল? একুশের চেতনার বাস্তবায়ন নিয়ে এদেশে শব্দের অপচয়তো কম হয়নি। প্রতিটি একুশে শত প্রতিকূলতা, বিরুদ্ধ পরিবেশে উচ্চারিত হয়েছে আমাদের শপথ। তবে কেন এই সাম্প্রদায়িক শক্তির আস্ফালন? আমাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কোন দুর্বলতার রস পেয়ে এই বিরুদ্ধতা সজীব হয়? সমকালীন এই পরিবেশ দেখে আমরা কি সিদ্ধান্ত টানতে পারি, একুশ ব্যর্থ হয়ে গেছে? সাম্প্রদায়িক শক্তির বিষাক্ত ছোবল যখন উৎপেতে আছে আমাদের আক্রমণের জন্য, তখন স্বভাবতই এমনি স্বতন্ত্র প্রশ্ন উকি দেয় আমাদের মনে।

একুশ ব্যর্থ হয়ে গেছে, এটা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে একুশের পরাজয়ের চিহ্নগুলো যেন স্পষ্ট হচ্ছে দিন দিন। একুশ ভাষার লড়াই, জনগণের জীবনের মৌলিক সমস্যা সমাধানের কোন নিয়ামক শক্তি নয়। একটি শ্রেণী বিভক্তি সমাজে অনেক দ্বন্দ্ব থাকে। ভাষার দ্বন্দ্ব এমন একটি দ্বন্দ্বের ফসল। এর সাথে সমাজের ব্যাপক শ্রমজীবি মানুষের সাথে উৎপাদন ব্যবস্থার যে দ্বন্দ্ব-তার সাথে খুব একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। তবুও ভাষার আন্দোলন আমাদের দেশে শেষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রতিদিন এর ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে প্রতিটি মানুষের চেতনায়। শানিত করছে তাদের চেতনাকে। এই চেতনা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, শোষণ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। একুশ ছিল এদেশের মুক্তিকামী মানুষের অপেক্ষাকৃত প্রথম সচেতন বিস্ফোরণ। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেইসব দেশের ব্যাপক নিপীড়িত মানুষ যখন পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলনে নেমেছে ঠিক সেই সময় এক শ্রেণীর স্বার্থান্ধ ধর্মীয় নেতা এইসব আন্দোলনের বিপক্ষে তৎপরতা চালিয়েছে। যে সমাজে ধনী ও দরিদ্রে বিভক্ত সেই সমাজে কোন ব্যক্তিই তার

আচরণের দ্বারা নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। প্রতিটি ব্যক্তির তৎপরতা কোন না কোন ভাবেই একটি বিশেষ শ্রেণীর আর্থিক স্বার্থ বা তার শ্রেণীদর্শনকে প্রতিফলিত করেন। হয়তো আন্দোলনকামী জনতার স্বার্থে কিংবা বিপক্ষে। একটি আন্দোলনের কর্মসূচী এবং তার নেতৃত্বের চরিত্র নির্ধারণ করে সেই আন্দোলনের শ্রেণী চরিত্রটি কি? চূড়ান্তভাবে কোন শ্রেণীর স্বার্থটি ফুটে উঠেছে সেই আন্দোলনে। ভাষার আন্দোলন ঐ মুহূর্তে সরাসরি অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন ছিল না। এ আন্দোলন তার সূচনালগ্নে শহরের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা ছাত্রদের এবং মেহনতী মানুষের কিছু অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবুও চরিত্রগত দিক থেকে এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত একটি বিশেষ সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, দিনে দিনে তা সম্প্রসারিত হয়েছে প্রতিটি প্রান্তরে। ভাষার আন্দোলন এদেশের পরিবর্তনকামী মানুষের চেতনার উর্বর জমিতে রোপন করেছিল ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা। পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠীর উপেক্ষা, নিষ্পেষণ, বঞ্চনা, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে বাঙ্গালীদের ব্যাপক সুযোগ না দেওয়া প্রভৃতি এদেশের মানুষের মনকে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ করেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে সকল বঞ্চনার নিষ্পেষণের সমাপ্তি হবে বলে মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল, তা ১৯৪৭ সালের পরও যখন বাস্তবায়ন হওয়ার লক্ষণ দেখা গেলনা তখন মানুষকে ভিন্ন কিছু ভাবতে উৎসাহিত করছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে ভাষার প্রশ্নে মানুষের মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিস্ফোরিত হল ৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে। তাই একুশের আন্দোলনকে শুধু ভাষার প্রশ্নে সীমিত করে দেখা এক ধরণের প্রতিক্রিয়াশীলতা। সত্যকে অত্যন্ত সীমিতভাবে দেখা। যে আর্থিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এদেশের মানুষকে ভারত বিভক্তিতে উৎসাহিত করেছিল, সেই আকাঙ্খাই ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিল। পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠী আর্থিক মুক্তির আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়ে উপনিবেশিক কায়দায় বাংলাদেশকে শোষণের এক দিবাস্বপ্নে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে আঘাত হেনেছিল আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির উপর। আর এই আন্দোলনের বিপক্ষে যারা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক প্রচারে লিপ্ত হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যটি ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা নয়, এই আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করা। এর দ্বারা শাসক গোষ্ঠী দুই ধরণের লাভবান হন। এক :—উগ্র সাম্প্রদায়িকতার আবরণে জনগণের আর্থিক মুক্তির আন্দোলনটি ধামাচাপা দেন। দুই :—এই কুট তর্কের দ্বারা সারাদেশের মানুষকে ব্যস্ত রাখেন এই ক্ষেত্রে। বর্তমানে এমন একটি অবস্থা লক্ষ্যকরা যাচ্ছে। দেশে যেখানে প্রতিদিন ভূমিহীনের ও বেকারত্বের সংখ্যা বাড়ছে, দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে, নৈতিকভাবে অধঃপতিত হচ্ছে মানুষ, যখন এই ঘুনেধরা পশ্চাৎপদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ব্যাপক শ্রমজীবি মানুষের কোন প্রত্যাশাই পূরণ করতে

পারছে না, যখন এই সমাজ ভেঙ্গে নতুন একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য তখন সমাজ বিপ্লবের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য শাষকগোষ্ঠী এই নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়ে সমাজের সকল মৌলিক সমস্যাকে চাপা দিয়ে সৃষ্টি করল নতুন বিতর্ক। ভাবখানা যেন এই নিষেধাজ্ঞা না থাকলে সবাই রবীন্দ্র সংগীত গাইত বা গাইতে পারত। একে কেন্দ্র করে ভাগাভাগী হল বুদ্ধিজীবিরা। যারা রবীন্দ্র সংগীতের পক্ষে রইলেন তারা প্রগতিশীল। তখন তাই ছিলেন অবশ্য, কিন্তু এই প্রগতিশীলতা অত্যন্ত তাৎক্ষণিক ব্যাপার। বিষয়টাতো এমন নয়, রবীন্দ্র ভক্ত মানেই সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ বিরোধীতা। অথচ একে কেন্দ্র করে বিরাট বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, আড়াল হয়েছিল সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সামাজিক মুক্তির প্রশ্নটি।

একুশের আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে যে আকাঙ্খা সঞ্চয়িত হয়েছিল, আকাঙ্খার সেই পুষ্প এখনও ফোটেনি। এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সরকার, রাষ্ট্র, পতাকা, অনেক কিছুই। এই পরিবর্তন ছিল মুলতঃ সমাজের উপরি কাঠামোর। পাকিস্তান আমলে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর ছিল আজও তা অব্যাহত। ফলে শোষনের নিষ্ঠুর থাবা এখনও ক্ষত বিক্ষত করছে হাজারো মানুষের জীবনকে। শোষনের এই ব্যবস্থার যতদিন পর্যন্ত মূলউৎপাটন করা যাবে না, ততদিন পর্যন্ত সবুজ বাংলা, স্বনির্ভর বাংলা, নতুন বাংলা, ইসলামী প্রজাতন্ত্র, ইত্যাদি চটকদার শ্লোগান এবং বিতর্ক থাকবে। শোষণের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে যে সামন্তবাদী অবশেষ ও ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত রয়েছে। সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে বারবার এই অশুভশক্তি মাথা তুলে দাঁড়ায়, বিতর্ক সৃষ্টি করে, এইসব রকমারী জ্বালাতনের হাত থেকে মুক্তির জন্য চাই সমাজ বিপ্লব। চাই উৎপাদনের নতুন ব্যবস্থা। যেখানে শোষণের কোন অবকাশ থাকবে না, শোষণ না থাকলে নির্যাতনের প্রশ্ন থাকবে না। ভাষা, সংস্কৃতি কৃষ্টির উপর আঘাত আসবে না, রাজপথে রক্ত ঝড়বে না। কারণ এগুলো করা হয় শোষণকে টিকিয়ে রাখার কারণে। একাত্তুর সালের পূর্বে যারা আন্দোলনের শত্রু-মিত্র ছিল, আজ তিরাশি সালে জনতার সামাজিক মুক্তি ও শোষণবিরোধী আন্দোলনে সবাই মিত্র একথা সত্য নয়। সেদিনের অনেক মিত্র আজ তাদের ধ্যান-ধারণা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দর্শন, শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে জনগণের শোষণ মুক্তির আন্দোলনের শত্রু। এই বাস্তব সত্যকে বিবেচনায় রেখেই পা ফেলতে হবে সামনের দিকে। সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের এই মুক্তি এনে দিতে পারে সমাজের মেহনতী মানুষের দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ একটি আন্দোলন। যে আন্দোলন পরিচালনা করবে সর্বহারা শ্রেণীর শৃঙ্খলশীল অগ্রগামী তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত শ্রমিক শ্রেণীর একটি সুশৃংখল বিপ্লবী পার্টি, এর কোন বিকাশ নেই। যারাই

বিকল্পের সন্ধানে পথ হাতড়িয়েছেন, তারাই ব্যর্থ হয়েছেন, সময় ক্ষেপন করেছেন, ইতিহাস এই কথাই বলে।

বাহান্ন সালের একুশ যে শোষণবিরোধী অসাম্প্রদায়িক চেতনার জন্ম দিয়েছে, একমাত্র এই পথেই তার পরিপূর্ণতা আসতে পারে। অন্যপথে যে আসবে না তা তো গত একত্রিশ বছরে বার বার প্রমাণ করে দিয়েছে। তাই আসুন এবারের একুশের এই যুগ সন্ধিক্ষণে এই প্রমাণিত সত্যের পতাকা হাতে এগিয়ে চলি, সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার সহ নাম না জানা শত শহীদের স্বপ্নের সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে। জীবনের ব্যর্থতার আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে পা রাখি সেই মহাসত্যের দিকে। আর নয় প্রতীক্ষা, আর দ্বিধা নয়, শুরু হোক জোট বেঁধে, নতুন পথ চলা।

উত্তরসূরীদের কর্তব্য—

—সাইফুল আলম দুলাল

ভাষা, ধর্ম এবং নাগরিকত্ব মানুষের জন্মগত সূত্রে প্রাপ্ত। আর মাতৃভাষা হচ্ছে একটি জাতির আত্মবিকাশের উৎকৃষ্ঠতম মাধ্যম। ভাষা ব্যতীত তথা মাতৃভাষা ব্যতীত কোন জাতির অগ্রগতি কল্পনা করা যায় না। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের উন্নতি মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব।

পাকিস্তান জন্মের ভিতর দিয়ে বাঙালীজাতি ঐ দেশের প্রদেশ হিসাবে গণ্য হতে থাকলে ঐ দেশের শোষক এবং শাসক গোষ্ঠী এ'প্রদেশকে চিরকাল পদানত করে রাখার উদ্দেশ্যে জাতির ভাষাকেই প্রথম আঘাত হেনেছিল। তদানন্তিন সরকার বাংলা-ভাষাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা দিয়েছিল কিন্তু এ ঘোষণার বিরুদ্ধে অবস্থান নিল। বাঙালী ছাত্র সমাজ তথা গোটা বাঙালী জাতি।

শুরু হলো "সংগ্রাম" বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। সংগ্রামের পথ বেয়ে বাঙালীজাতি এগুতে থাকলো ৫২'র একুশে ফেব্রুয়ারীতে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা অনেক ছাত্র জীবন দিয়ে সংগ্রামের ধারায় গতিবেগ সৃষ্টি করলো। আর এ একুশ বছর বছর নতুন নতুন সাজে এগিয়ে আসতে লাগলো পরিশেষে স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ৭৫'এর পট পরিবর্তনের পর থেকে এ ভাষাকে নিয়ে নানা পর্যায়ে চলছে নানা চক্রান্ত। যারই ফলশ্রুতিতে উর্দ্দুর পরিবর্তে দু'টি বিদেশী ভাষার খোলসে শত্রুরা আবার মরিয়া হয়ে উঠেছে এ জাতির পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করতে। যাকে মোকাবেলার ভিতর দিয়ে একুশের শহীদদের রক্তদান যথার্থ হবে। আজ বরকত জব্বারের উত্তরসূরীদের এটাই কর্তব্য।

ধূমপানকারী ভাইদের জন্য সু-খবর !

আবার আসছে আপনাদের সুপরিচিত—

'সুরুয বিড়ি'

প্রোঃ—অতুল চৌধুরী এণ্ড সন্স

কুড়িগ্রাম, রংপুর।

টাট্‌কা, সুস্বাদু ও পরিচ্ছন্ন খাবার পেতে হলে

চলে আসুন—

জোনাকী'তে

প্রোঃ—সেরু মিয়া

কলেজ মোড়, কুড়িগ্রাম।

ধূমপানকারী ভাইয়েরা, ধূমপানে তৃপ্তি পেতে হলে—

'জলিল বিড়ি' কিনুন।

পুরাতন ষ্টেশন, কুড়িগ্রাম।

রক্তলাল ফেব্রুয়ারী

একুশে প্রকাশনা—১৯৮৩ ইং

★ "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারী।"

★ "বন্ধু, সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি
বুঝে নিক দুর্বিত্ত।

সম্পাদনা : হারুন অর রশীদ লাল

মহান একুশ উৎযাপন কমিটী—রুড়িগ্রাম।